অধ্যাপক ড. আতিকুল ইসলাম

২০১৬ সাল থেকে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কাজ করছেন। অস্ট্রেলিয়ার পার্থের এডিথ কোয়ান ইউনিভার্সিটির ব্যবসা ও আইন অনুষদের নির্বাহী ডিন এবং উপ-উপাচার্য (এনগেজমেন্ট) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিন দশক ধরে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে। দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে তিনি ইউনিভার্সিটি অব সিডনি, এনএসডব্লিউ, কার্টিন ইউনিভার্সিটি, ক্যানটারবেরি ইউনিভার্সিটি এবং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সিঙ্গাপুরে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের উচ্চ শিক্ষা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে *বণিক বার্তার* সঙ্গে কথা বলেছেন।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাবিদিন ইব্রাহিম**

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রির সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি

বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রির একটা সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে নর্থ সাউথসহ অন্য নেতৃস্থানীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রির সম্পর্ক কেমন?

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে কল-কারখানার সম্পর্ক ভালো। তবে আমাদের দেশের কারখানাগুলো এখনো পুরনো আমলেই রয়ে গেছে। বেশির ভাগ কারখানারই তেমন আধুনিকায়ন হয়নি এখনো। দেশের কারখানাগুলো এখনো নিজস্ব গবেষণার দ্বার উন্মোচন করতে পারেনি। তারা বিদেশী গবেষণার ওপরই নির্ভর করছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপসহ উন্নত দেশগুলো এমনকি পাশের দেশ ভারতের তুলনায় এখানকার কারখানাগুলোয় দক্ষতারও বেশ কমতি রয়েছে। আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন কারখানার সহযোগিতা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। তবে তারা এখনো তাদের গবেষণার উন্নতির বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেনি। পশ্চিমা দেশে কোনো কারখানায় সমস্যা হলে সমাধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা রিসার্চ সেন্টারের সঙ্গে চুক্তি করে। আমাদের দেশে এ প্রবণতা গড়ে ওঠেনি। যদিও আমাদের দেশে এ বিষয়ে আমরা কাজ করছি। বিশেষ করে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বেশকিছু কারখানার সম্পর্ক ভালো। কারণ আমাদের সিলেবাসটা তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই তৈরি করি। আমাদের ক্লাসে কোর্স রিলেটেড কারখানার এক্সপার্টরা এসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। ফলে আমাদের শিক্ষার্থীরা এখান থেকে বৈশ্বিক একটা ধারণা পায়। আমাদের সব শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপ করতে হয়। এখানকার একজন শিক্ষার্থীকে কম হলেও ১২ সপ্তাহ ইন্টার্নশিপ শেষ করে তাকে প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। এতে যে সুবিধা হয়, তাদের বেশির ভাগই যেখানে ইন্টার্ন করে সেখানেই কাজের সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে আমরা কারখানাগুলোর সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করি। এক্ষেত্রে নর্থ সাউথ সঠিক ভূমিকায় রয়েছে বলে মনে করি। অন্য শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এ পথে এগোচ্ছে। সব মিলিয়ে দেশের উচ্চ শিক্ষার এ খাতটির অগ্রযাত্রা ইতিবাচক।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সমালোচনা রয়েছে, এটি ব্যয়বহুল। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ও এ সমালোচনার মধ্যে পড়ে। শিক্ষার্থীদের এ ব্যয়ের ভার কমানোর জন্য ইন্টার্নশিপ, স্কলারশিপ এ রকম সুযোগ কেমন রয়েছে?

বাজারে নানা ধরনের পণ্য আছে, সবগুলোর কি এক দাম, সবগুলো কি ব্যয়বহুল? সব হোটেলের কি এক চার্জ? সব রেস্টুরেন্টের খাবারের দাম এক রকম? সব কাপড়ের কি এক দাম? কার তুলনায় ব্যয়বহুল, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায়? এ প্রশ্নগুলো মাথায় রাখতে হবে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোটা সরকারের অর্থায়নে হয়। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা পিন পর্যন্ত টাকা দিয়ে কিনতে হবে। এখন এটার জন্য মূল্য কে পরিশোধ করবে? সরকার দেবে, না হলে অভিভাবকরা দেবে। অন্যথায় কোনো মানবহিতৈষী এটা পরিশোধ করবে। কারো কাছ থেকে অর্থটা আসতে হবে। টাকা ছাড়া তো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আপনাকে কেউ কিছু দেবে না। কাগজ, কলম যা-ই বলুন সব টাকা দিয়ে কিনতে হবে তো। সে হিসেবে অবশ্যই ব্যয়বহুল। কিন্তু বাংলাদেশের চেয়ে সস্তা শিক্ষা ব্যবস্থা আর কোথাও নেই। আমি কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জানি যারা ক্রেডিটপ্রতি ১৫ ডলার বা দেড় হাজার টাকা চার্জ করে। বিদেশে যদি এ খরচের কথা বলা হয়, তাহলে মানুষ হাসবে। আমাদের দেশে জীবনযাপনের ব্যয় অন্য দেশের তুলনায় কম। মানুষের উপার্জন কম, কাজেই এখানে বিদেশের মতো ব্যয়বহুল শিক্ষা সম্ভব হবে না। ব্যয়বহুল হলেও আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন, তাহলে দেখবেন এতটা ব্যয়বহুলও না। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় করলে জমি কিনতে হবে, বিল্ডিং ফ্যাসিলিটিজ, ল্যাব, স্টুডেন্ট, স্টুডেন্ট ডরমিটরিস, খেলার মাঠসহ একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করলে এসব অনুষঙ্গ লাগে। এতে শত শত কোটি টাকা দরকার। সরকার তো সেগুলো আপাতত দিচ্ছে না। এখন সেগুলোর টাকার ব্যবস্থা কোত্থেকে হবে? শিক্ষার্থীরা নিচ তলায় জুতোর দোকান, ওপর তলায় ইউনিভার্সিটি এমন ভবন থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে যাবে। আমরা যদি সেগুলো না-ও চাই, তাহলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা অর্থনৈতিক মডেল তো থাকবে। আমরা শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত চার্জ করব না। আমরা যে চার্জ করব তার মধ্যে আমাদের খরচগুলো হয়ে কিছু একটা উদ্বৃত্ত থাকবে। যেটা দিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার উন্নতি করতে পারব। স্কলারশিপের ক্ষেত্রে আমি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলতে পারব না। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছর কমপক্ষে ২০ কোটি টাকার স্কলারশিপ দিচ্ছে। কভিডের সময় আমরা ১২০-১৩০ কোটি টাকা স্কলারশিপ দিয়েছি। একটা কথা আমরা বলতে পারি, এখানে ভ্যানগাড়ি চালকের ছেলেমেয়েরা পড়ে, রিকশাওয়ালার ছেলেমেয়েরা পড়ে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু বড়লোকের ছেলেমেয়েরা পড়ে তা নয়। ঠেলাগাড়ি চালায় ওনাদের ছেলেমেয়েও আছে, রিকশা চালায় তাদের ছেলেমেয়েও আছে। ড্রাইভারদের ছেলেমেয়ে আছে যারা ব্যক্তিগত গাড়ি ড্রাইভ করে। এখন যদি কেউ মেধাবী হয়, তাহলে নর্থ সাউথে স্কলারশিপের মাধ্যমে পড়ার সুযোগ রয়েছে। আমি উদাহরণ দিই, শুধু ভর্তি পরীক্ষায় আমরা ১০০ স্কলারশিপ দিই। শীর্ষ ১০০-তে যারা থাকে। মুক্তিযোদ্ধা কোটা আছে, তাদের আমরা এক পয়সাও চার্জ করি না। তাদের ভর্তি পরীক্ষায়ও টাকা দেয়া লাগে না। এটা আমাদের আনন্দ দেয়। আমি মনে করি, আমরা দেশের খেদমত করছি, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান দেখাচ্ছি। নর্থ সাউথে ভর্তি হওয়ার পরই রেজাল্ট মোটামুটি ভালো বা পাস করে যাচ্ছে, এ রকম কোনো ছাত্রের টাকা-পয়সার জন্য লেখাপড়া বন্ধ হয়নি। এমন কোনো উদাহরণ নেই। এটা ঠিক, আমাদের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই নিম্নমধ্যবিত্ত। এরা টিউশনি করে পড়ে, মেসে থাকে। তারা অনেক স্ট্রাগল করে পড়ে, এটা সত্য কথা।

শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো ডরমিটরি করার পরিকল্পনা আছে আপনাদের?

পরিকল্পনা তো আছে, আমরা নতুন ক্যাম্পাস করতে পারলে অবশ্যই ডরমিটরি বানাব। তাছাড়া আমরা এখনই চিন্তা করছি যে আশপাশের কোনো বিল্ডিং ভাড়া নিয়ে করা যায় কিনা। ডরমিটরি একটা জিনিস আর ছাত্রদের ট্রান্সপোর্ট। এ দুটোতে আমরা পিছিয়ে আছি। আমাদের এ দুটো ক্ষেত্রে আরো উন্নত হওয়া প্রয়োজন।

বিদেশী ছাত্র আকর্ষণে আপনাদের কোনো কর্মসূচি আছে কি?

আমরা বিদেশী ছাত্র আকর্ষণের কোনো চেষ্টা করি না। যারা আসে তারা স্বেচ্ছায় আসে। সেটা ভুটান বা নেপালের হোক কিংবা শ্রীলংকার হোক। আফ্রিকার কিছু দেশ যেমন কেনিয়া, সোমালিয়া থেকেও কিছু ছাত্র আসছে। আমরা তাদের আকর্ষণ করানোর জন্য কিছু করি না। আমাদের ওটা করতে গেলে ভালো ধরনের ডরমিটরি লাগবে। আমাদের যে র‍্যাংকিং ও ইমেজ, ইচ্ছা করলে তো তিন মাসের মধ্যে চীন থেকেই চার হাজার ছাত্র নিয়ে আসতে পারি। কিন্তু আমাদের সে রকম ফ্যাসিলিটিজ তো থাকতে হবে। বিদেশী ছাত্র বাড়াতে পদক্ষেপ নেব তবে এতে আমাদের তাড়াহুড়ো নেই। বিদেশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা আছে। বাংলাদেশ এখন যে অবস্থায় আছে তা এখন থেকে প্রায় ২৫ বছর আগে মালয়েশিয়ার অবস্থার মতো। দেশটির ছাত্ররা সব উন্নত দেশে যেত শিক্ষা গ্রহণ করতে। এখন বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা সে দেশে পড়তে যায়। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া তারা এখন বিভিন্ন দেশের ছাত্র পড়ায়।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম কি যথেষ্ট মনে হয়?

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আমরা অবশ্যই উৎসাহিত করি। আমাদের এখানে ২৩-২৪টি ক্লাব আছে। এর মধ্যে কিছু এক্সট্রা কারিকুলার ক্লাব, যেমন ড্রামা ক্লাব, ফটোগ্রাফি ও ফিল্ম ক্লাব। আবার কতগুলো আছে কো-কারিকুলার বা সহপাঠ কার্যক্রম। যেমন ফার্মাসি ক্লাব, ইকোনমিকস ফোরাম। এ রকম বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলার ও কো-কারিকুলার ক্লাব ও সংস্থা রয়েছে। নর্থ সাউথের মতো এত সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম বাংলাদেশের আর কোনো প্রাইভেট ভার্সিটিতে হয় না। আমাদের ছেলেরা ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, জারি, সারি, মারফতি গান পছন্দ করে। আবার তারা ব্যান্ডও পছন্দ করে। এখানে সবকিছুর চর্চা হয়। আমাদের যে অডিটরিয়াম আছে, স্টেজ, গ্রিনরুম আছে এবং অন্য সুযোগ-সুবিধা আছে তা বাংলাদেশের কোনো ইউনিভার্সিটির আদৌ আছে কিনা (এই মানের) তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমাদের এখানে স্বরস্বতী পুজা ও মিলাদ হয়। ইউনিভার্সিটি এক ধর্মের লোকের জন্য বা এক গোত্রের লোকের জন্য নয়। ইউনিভার্সিটি মানে এখানে বৈশ্বিক ব্যাপার রয়েছে। আমরা সেটি চর্চা করি। তাই মাঝেমধ্যে যে হইচই দেখেন, তাতে ভীত হওয়ার কিছু নেই।

আমাদের উচ্চ শিক্ষা খাতে বড় মাথাব্যথার কারণ হচ্ছে মেধা পাচার বা ব্রেন ড্রেইন। আমরা অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী তৈরি করি কিন্তু সে অনুযায়ী তাদের বাংলাদেশে রাখার ব্যবস্থা করতে পারছি কিনা বা তারা এখানে ভালো কাজের সুযোগ পাচ্ছে কিনা।

মেধা পাচারের ক্ষেত্রে একসময় শুধু বিদেশে যেত, ফিরে আসত না। এখন কিন্তু ফিরে আসা শুরু হয়েছে। আবার বিশ্বায়নের যুগে কেউ অন্য দেশে গেল মানে সব শেষ হয়ে যাওয়া নয়। কেউ এখন বাংলাদেশে আছে, কিছুক্ষণ পর দুবাই বা যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে পারেন। দুইদিন পর ঘুরে চলে আসতে পারেন। দুনিয়াটা এখন এ রকম হয়ে গেছে। মেধা পাচার এখনো হচ্ছে, তবে কমে আসছে। আমাদের যেটা সমস্যা, বাইরের লোক এসে এখানে কাজ করছে। কয়েকটি ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা নিজেদের লোক তৈরি করতে পারছি না। তারা যে উচ্চ দক্ষতার কর্মী এমনটাও নয়। মধ্যম শ্রেণীর কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন লোক দরকার। সেখানে ভারত, শ্রীলংকা বা অন্যান্য দেশ থেকে লোক নেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের লোক তৈরি করার সক্ষমতা থাকতে হবে। যারা বিদেশে যায়, তারা আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকলে ভালো হয়। আমাদের সেখান থেকে শেখা ও তার বাস্তবায়ন করা উচিত। বিদেশে শিখে এল, এখানে বাস্তবায়ন করল। বিশ্ব এখন এভাবেই চলছে। মানুষ আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকবে, এটাই প্রত্যাশিত।

আপনারা ব্যবহারিক জ্ঞানের (অ্যাপ্লায়েড নলেজ) পাশাপাশি হিউম্যানিটিজ বা মানবিকে অনেক জোর দিচ্ছেন। মানবিক বিদ্যা জরুরি মনে করেন কেন?

একজন শিক্ষার্থী যখন কাজের দুনিয়ায় প্রবেশ করে তখন ব্যবহারিক ও মানবিক দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। ধরেন, কোনো কর্মী অনেক দক্ষ কিন্তু সে তার পাশের সহকর্মীর সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলতে পারে না, বস কিংবা গ্রাহকদের সঙ্গে ঠিকমতো ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে না তাহলে কি চলবে?

আমরা প্রথমত চাই, আমাদের শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভূমিকা রাখতে পারবে। দ্বিতীয়ত, তারা নৈতিক মানে উন্নত হবে। তৃতীয়ত, তারা আমাদের সমাজ ও বিশ্ব সম্পর্কে যথেষ্ট জানবে। তাদের মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতার সম্পর্ক থাকবে। আমরা সাধারণ দক্ষতার ওপর গুরুত্বারোপ করি। জেনারেল এডুকেশন যেটি রয়েছে, আমাদের পদার্থের ছাত্রের ইতিহাস পড়তে হয়, ব্যবসায় শিক্ষার ছাত্রের পদার্থ, রসায়ন পড়তে হয়। আমরা তাদের গ্লোবাল গ্রাউন্ডিং দেয়ার পর স্পেশালাইজেশনের দিকে যেতে দিই।

ভবিষ্যতে প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ খাত নিয়ে আপনারা কেমন কাজ করছেন? আপনাদের কোনো উদ্ভাবন আছে?

আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করছি। এছাড়া চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যেসব বিষয় রয়েছে, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ব্লক-চেইন সবকিছুই আমরা পড়াই। উদ্ভাবন তো প্রতিদিনই হচ্ছে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়েও ছোট-বড় আকারে হচ্ছে। স্যাটেলাইট ডিজাইনে আমাদের একটি দল বৈশ্বিক একটা কমপিটিশনে শীর্ষ দশে জায়গা করে নিয়েছে। আমাদের এনএসইউ স্টার্টআপ ট্রেনিং সেন্টার আছে।

আপনি প্রশাসক হিসেবে কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন?

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভালো শিক্ষক হওয়া। শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে শিক্ষকের মান উন্নত করতে হবে। উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন, গবেষণায় ভালো এবং ছাত্রবান্ধব এ সবগুলো মিলে শিক্ষক পাওয়া খুবই কঠিন। বাংলাদেশে প্রায় ১০৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, ডিন ও অধ্যাপক দরকার। কিন্তু যোগ্যতাসম্পন্ন এত লোক তো বাংলাদেশে নেই। আমরা এখন বাইরে থেকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি। দেশের বাইরে যারা বাঙালি আছেন, তাদের দেশে আসতে বললে তারা আসছে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভালোমানের শিক্ষক পাওয়া।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়কে আপনি কোথায় দেখতে চান?

আমাদের দেশ যত উন্নত হবে, মানুষের আয় তত বাড়বে। শিক্ষার প্রতি মানুষ খরচ করবে। এখন অনেকেই কষ্ট করে হলেও ছেলেমেয়েকে ভালো শিক্ষা দিতে চায়। বাংলাদেশের উন্নতির সঙ্গে এটা জড়িত। বাংলাদেশ অর্থনীতিতে যেভাবে অগ্রগতি করছে, সেভাবে অব্যাহত থাকলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিকশিত হবে। বিকশিত হবে এ কারণে যে তারা গতিশীল, কম আমলাতান্ত্রিক, তাদের ওপর অন্যান্য সামাজিক চাপ কম, তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। আমার মতে, আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশের ১৫-২০টি বিশ্ববিদ্যালয় খুব উচ্চ পর্যায়ে চলে যাবে। এমনকি তারা আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত হবে। বাংলাদেশে জ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের জায়গায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

পিএইচডি চালুর বিষয়ে আপনারা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন? সে বিষয়ে আপনারা কতদূর এগোতে পেরেছেন?

বাংলাদেশে গবেষণাকে যদি বাড়াতে হয় তাহলে শীর্ষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যারা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করবে তাদের পিএইচডি ছাত্র নেয়ার সুযোগ দেয়া দরকার। কারণ পিএইচডি ছাত্ররাই রিসার্চ বা গবেষণার কাজটি বেশি করে। আমাদের এখানে বিশ্বমানের অনেক অধ্যাপক আছেন, কিন্তু তারা পিএইচডি ছাত্র গ্রহণ করতে পারছেন না। আমরা যে পর্যন্ত যোগ্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পিএইচডি করার সুযোগ না দিচ্ছি, সেই পর্যন্ত জাতি বঞ্চিত হবে। আমরা আবেদন জানিয়েছি কিন্তু পিএইচডি অনুমোদন হবে কিনা তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে সরকারের ওপর। তবে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) আমাদের প্রতি ইতিবাচক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এটা গুরুত্ব দিচ্ছে কিনা বা সংসদে তা উত্থাপন হচ্ছে কিনা তা দেখার বিষয়। জাতীয় স্বার্থেই পিএইচডি গবেষণার সুযোগ দেয়া উচিত। সব বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়ার দরকার নেই। যাদের গবেষণা করানোর মতো অধ্যাপক রয়েছেন এবং পর্যাপ্ত স্টাফ রয়েছেন তাদের এ সুযোগ দেয়া যায়।